ষষ্ঠ অধ্যায়

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। ঊনবিংশ শতকেই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় মুষ্টিমেয় বাঙালি মানসে। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজ জীবনে যত কিছু মতনৈক্য, পরস্পর বিরোধী মনোভাব, বিদ্বেষ জাতিভেদ প্রথার তীব্র মনোভাব দেখা দিয়েছিল তার সবটাই ধর্মীয় ভাবধারাকে কেন্দ্র করে। এই সময়ে জমিদারও তাদের প্রতিনিধিদের যে অসহনীয় অত্যাচার কেমন নির্মম আকার ধারণ করেছিল সমাজের সাধারণ প্রজাবর্গের উপর তার অনুসন্ধান করব ঊনবিংশ শতকের নবসাহিত্য ধারা মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্য মূল্যায়ণের এই অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করব সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য। এই ধর্ম সাহিত্যেগুলির মধ্যে মানুষের বাস্তব জীবন কথা কেমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার আলোচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের ভাষা, রচনারীতি, হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর পরিচয়ের সন্ধান করব। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে কীভাবে ধর্মকর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছেন ও গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কীভাবে মানুষের অগ্রগতির চিরকল্যাণময় কর্মের পথিক হয়ে কর্মভার বহন করেছেন। ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত সেই সময়কার পরিবেশ পরিস্থির পরিচয় যেমন তাঁদের জীবনীমূলক ধর্ম সাহিত্যে ধরা পড়েছে তেমনি সাহিত্যের নানা দিক ব্যক্ত হয়েছে এই সাহিত্যগুলির মধ্যে। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্ম জীবন ও ধর্ম জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় যে জীবনী সাহিত্য রচনা হয়েছে তাঁর সাহিত্য মূল্য অনুসন্ধান করব মূল আকর গ্রন্থগুলি থেকে। মূল আকর গ্রন্থগুলি হল—

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'—কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার।

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত'—আচার্য মহানন্দ হালদার।

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য'—বিচরণ পাগল।

'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন'—কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার।

'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত'—অশ্বিনীকুমার সরকার।

'শ্রীশ্রীগোপালচাঁদ লীলাসঙ্গীত'—সূর্য্য গোঁসাই।

'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা'—বিচরণ পাগল।

'হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত'—ড. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

এছড়াও রয়েছে অগণিত মতুয়া সাহিত্য সম্ভার। আমার গবেষণা কাজের জন্য উপরি উল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে গ্রহণ করলাম সাহিত্য মূল্য নির্ধারণের জন্য। কেননা এই গ্রন্থগুলিই মূল আকর গ্রন্থ। আরো মতুয়া গ্রন্থগুলিকে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছি সেগুলি পরে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে রাখছি। সহায়ক গ্রন্থগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে লিখছি। বাংলার উনিশ শতকের সামাজিক ধর্মীয় প্রেক্ষাপট জানার জন্য যে গ্রন্থগুলিকে গবেষণা কাজে ব্যবহার করেছি সেগুলি। আর মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের মূল আকর গ্রন্থগুলি ছাড়াও আরো অনেকগুলি গ্রন্থকে সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার ব্যবহার করেছি সেগুলিকেও সহায়ক গ্রন্থ তালিকায় রাখব।

মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির সাহিত্য মূল্যায়ন করতে হলে মতুয়া উপাধিতে আখ্যায়িত কাহিনিটির কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থে মতুয়া উপাধিটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

'দেশ ভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া'

.....

সবে করে উপহাস ওই বেটা মতো।।

তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।

ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।।''[১]

হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া' ধর্ম প্রচার করেছেন সকলে একথা জানেন। এই আখ্যাটি সমাজের মানুষের দেওয়া। হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামে মত্ত হওয়া মানুষদের আপন করে নিলেন ও মতুয়া আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়া মানুষদের সঙ্গে ভিন্ন সম্প্রদায় হয়ে গেলেন। মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য আলোচনার আগে হরিচাঁদ ঠাকুরের সময় সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতকের অনেক গ্রন্থ থেকে। 'ভারতের সাধক-সাধিকা' গ্রন্থে সুবোধ চক্রবর্তী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট ও তাঁর ধর্ম ভাবনা আলোচনা করেছেন। সুবোধ চক্রবর্তীর ভাষায় হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব প্রেক্ষাপটটি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

''ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ। ভারতের বুকে ঈশ্বরের নামে,

ধর্মের নামে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ধর্ম্মোন্মাদের দম্ভ ও আস্ফালন। অপরিসীম ঘৃণা ও অবহেলা মানুষে মানুষে রচনা করেছে বিভেদ ও বিসংবাদ। ধর্ম আবদ্ধ হয়েছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের অতি যত্নে রচিত বিগ্রহ ও প্রতিষ্ঠানে। মানবতা নীতি ও মূল্যবোধ দলিত মথিত।

ব্রাহ্মণবাদের ব্যবচ্ছেদে সমাজে রচিত হয়েছে জাতিভেদের চূড়ান্ত ঘৃণ্য ব্যবস্থা। ধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ ও শিক্ষার আলোকে আলোক প্রাপ্ত তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সঞ্চারিত হয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দলিত, অবহেলিত, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ মানুষের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে দেবভূমি ভারতের আকাশ বাতাস।''[২]

সমাজের এহেন বাস্তব পরিস্থিতিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের পদার্পন ঘটে। তিনি সমাজের বাস্তব রূপকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই সমাজের মানুষের উপেক্ষার পাত্র হয়েও মানুষের উন্নতি কর্ম থেকে বিরত হন নি। কর্মন্নোতিই তাঁর সাধনা মানুষই তাঁর ধর্মস্থল কর্মস্থল। মানুষকেই তিনি ভালোবেসেছেন সারাজীবন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সূক্ষ্ম 'সনাতন ধর্মকে মতুয়া আখ্যায় ভূষিত হওয়ার ইতিহাসকে সুবোধ চক্রবর্তী এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''হরিচাঁদের কীর্ত্তনেরও এক অলৌকিক রূপ হরিবল ধ্বনির সঙ্গে চলে উদ্দণ্ড নৃত্য। সেই সঙ্গে গগনভেদী রবে বাজে মৃদঙ্গ করতাল আর জয়ডঙ্কা। উল্লম্ফন হুহুঙ্কার আর হরিবোল ধ্বনির মিশ্র ব্যঞ্জনায় ভক্তগণের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় অপূর্ব ভাবাবেশ। দিনে দিনে এই নামকীর্ত্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

হরিবোল নামে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে দলে দলে মানুষ। সে যেন নাম গানের এক নেশা। সেই নেশায় মাতিয়ে তুলেছেন তাদের ভক্তি ও সাধনার মূর্ত বিগ্রহ নাম প্রেমী হরিচাঁদ।''[৩]

সুবোধ চক্রবর্তী হরিচাঁদ ঠাকুরের 'মতুয়া' আখ্যার ইতিহাস যেমন আলোচনা করেছেন সেই সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের জাতিগত পরিচয়ও দিয়েছেন। আর 'হরিনাম' ভাবনা যে মানুষের জাত্যাভিমান বর্জন করতে সক্ষম; হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম ভাবনা বর্ণনায় তিনি মানুষের মূল্যবোধের পরিচয়ও দিয়েছেন যা শ্রীশ্রীলীলামৃত সহ মতুয়া গ্রন্থে অনেক ভক্তদের পরিচয়ে ব্যক্ত হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনা মানুষের আত্মসংস্কারের দ্বার উন্মক্ত করে এই মহাসত্যকে ব্যক্ত করেছে। সুবোধ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

> ''অন্তজঃ শ্রেণীর মানুষ হরিচাঁদ। এরা সমাজের অবহেলিত, অবজ্ঞাত শিক্ষাহীন এক সম্প্রদায়। উচ্চবর্ণের সমাজপতি ও ধর্ম ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের ভাষায় নমঃশূদ্র। হরিচাঁদের অশেষ কৃপায় হরিভক্তি আর হরিনামের আস্বাদন পেয়ে নমঃশূদ্র সমাজে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হল। সমাজপতিরা হরিনাম নিয়ে প্রকাশ্যে ডঙ্কা পিটিয়ে মাতোয়ারা হওয়ার ব্যাপারটিকে অবজ্ঞা উপেক্ষা করেই নাম দিল হরিবোলা মতুয়া দল। ক্রমে সেই নামেই পরিচিত হয়ে উঠল হরিচাঁদের ভক্ত সম্প্রদায়। দিনে দিনে হরিচাঁদ হয়ে উঠলেন এই নমঃশূদ্রের ঠাকুর। হরিভক্তি পরায়ণ জাত্যাভিমানবর্জিত বর্ণশ্রেষ্ঠ কোন কোন ব্রাহ্মণও নামের আকর্ষণে তার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে জীবন ধন্য করল। স্বজন ও সমাজের কটাক্ষ নিন্দা উপেক্ষা করে মিশে গেল তারা হরিনাম পাগল মতুয়াদের দলে।''[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ধর্মজগতের উচ্চস্তরে উন্নীত করেছেন। সেকথা হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মধারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনার মূল ভিত্তি হল সমাজ বাস্তবতার সর্ব্বময় উপস্থিতিতে। 'হরিনাম' করার সময় নির্ধারণ করেছেন এভাবে 'হাতে কাম মুখে নাম'। হাতের দ্বারা কর্মকে সম্পন্ন করার সঙ্গে সমভাবে হৃদয়ে অনবরত ভাবে হরিনাম ভাবনাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। তবেই একসঙ্গে ধর্মরক্ষা হবে 'হরিনাম' গানে আর বাস্তবের সমাজের কাজ সম্পন্ন হবে হাতের দ্বারা। এভাবে মানুষকে ধর্ম ও কর্ম ভাবনাকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন। শ্রীনাভাজী তাঁর 'বৃহৎ শ্রীশ্রীভক্তমাল' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুরের

ধর্মাদর্শের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন যথার্থ ভাবে। শ্রীনাভাজী হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর মূল্যায়নে যা বলেছেন তা হল—"সমাজের উপেক্ষিত ও নির্যাতীত মানুষকে সকল রকম নীচতা থেকে ধর্ম জগতের উচ্চমার্গে উন্নীত করার জন্য তার অবদান তুলনারহিত।"[৫] ধর্মভাবনার কর্মভাবনার বিকাশের জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কর্মভার অর্পণ করেছিলেন সেই তথ্যও শ্রীনাভাজী জানাচ্ছেন তাঁর গ্রন্থে এভাবে—"তিনি তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে মতুয়া সম্প্রদায়ের পরবর্তী গুরুরূপে নির্বাচিত করে যান।"[৬] হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ও ভক্তগণকে কেন্দ্র করে যে বাংলায় সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছে তার সাহিত্য মূল্য নির্ধারণ করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করব। পর্যায়গুলি হল—

সাহিত্য রচনারীতি, ভাষার পরিচয়।

ধর্ম সমন্বয়ী ভাবধারা ও মতুয়া ধর্মের গানের আলোচনা।

মতুয়াভক্তদের সামাজিক জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা।

মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

মানুষের দুঃখের কারণ ও দুঃখ থেকে আনন্দে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা।

সাহিত্য মূল্য আলোচনার পূর্বে মতুয়া ধর্ম সাহিত্য রচয়িতাগণের সময়কাল ও হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সময় অর্থাৎ কর্ম জীবনের সময়কালকে জ্ঞাত হই।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২ - ১৮৭৮) শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬ - ১৯৩৭) 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচয়িতা তারকচন্দ্র সরকার (১৮৫৩-১৯১৪) 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন' রচয়িতা। 'শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত' রচয়িতা অশ্বিনীকুমার সরকার (১৮৭৩ - ১৯২৯) 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' রচয়িতা মহানন্দ হালদার - গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাতি প্রমথরঞ্জনের সমবয়সি গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী লেখক। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' রচয়িতা বিচরণ পাগল ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী ভক্ত। তিনি 'শ্রীশ্রীহরিগুরুভক্ত চরিত' লেখেন। এই সময় কাল জানার থেকে বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনী সাহিত্য ও মতুয়া ধর্ম সাহিত্যগুলির আকর গ্রন্থগুলির রচয়িতাগণ সকলেই ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী ও তাদের নিত্যসহচর ভক্ত মানুষ। তাই রচনা সাহিত্যগুলিতে যে সাহিত্য গুণ, সমসাময়িক ঘটনাবলীর পরিচয়, কার্যাবলীর বিবরণ পাই তা সাহিত্যের রচয়িতাগণ প্রত্যক্ষ দেখেছেন ও তখনকার ভক্তদের

মুখে শুনেছেন। সেই ঘটনাবলীই তাদের সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কবিবর হরিবর সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ কালে 'অপিচ' বলে যে ভূমিকা লিখেছেন সেইখানে তিনি লেখক ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলির পরিচয় সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল—

> ''কবি রসরাজ মহাশয় মহাপ্রভুর সাময়িক শিষ্যগণের প্রমুখাৎ যে সমস্ত ঘটনাবলী শ্রুত হইয়াছেন, তাহা এবং তিনি নিজে প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া চাক্ষুস যাহা দেখিয়াছেন, তাহা ঠিক সেইভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের যে ঘটনা সমন্ধে যে স্থানে যে ক্রিয়া হইয়াছে; সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এ বিষয় প্রমাণ করিলে, যতটুকু লেখা হইয়াছে, ততধিক রূপে প্রমাণিত হইবে।''[৭]

সাহিত্য রচনা রীতি ও ভাষার আলোচনা :

গ্রন্থাকার তারকচন্দ্র সরকারকে আদেশ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ ও হরিপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং। এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলাকথাকে 'শ্রীহরিচরিত্র সুধা' নাম স্থির করে ওড়াকান্দি পাণ্ডুলিপি সহ যান গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে গুরুচাঁদ ঠাকুর শশীভূষণ ঠাকুরকে নামকরণের জন্য বলেন। কবি রসরাজ তারকচন্দ্রের বর্ণনায়—

> ''হস্তে করি পাণ্ডুলিপি শ্রীশশীভূষণ।
> 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' করে নামকরণ।।
> .....
> .....
> শুদ্ধ পাণ্ডুলিপি সহ ওড়াকান্দী ধামে।
> শ্রীগুরুচাঁদের পদে তারক প্রণমে।।
> নাম হতিহাস কহে গুরুচাঁদ ঠাঁই।
> .....
> যে নাম করেছে শশী সেই নাম ভাল।
> 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' নাম মধুর হইল।।''[৮]

গ্রন্থ রচনার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ আশীর্বাদ করেন তারকচন্দ্র সরকারকে। তারকচন্দ্র সরকার গ্রন্থ রচনা কাজে ভয় পেয়েছিলেন কিন্তু দশরথ বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস গোস্বামী গোলক ও হরিপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের আশীর্বাদে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচনা করেন। তারা সকলেই আশীর্বাদ ও রচনার বিষয়বস্তু ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচয়িতা তারকচন্দ্র সরকারকে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ বিশ্বাস, গোলক গোস্বামী ও হরিপুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে আদেশ করেন সেই অনুযায়ীই তারকচন্দ্র সরকার রচনায় সম্মত হলেও অনেক সময় নিয়েছেন লিখতে। তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থেই এই গ্রন্থ লিখবার আদেশ সম্পর্কে বলেছেন—

"মৃত্যুঞ্জয় দশরথ এই দুই জনা।
বলিলেন লীলামৃত করিতে রচনা।।
.....
দুই প্রভু বলে হরিচাঁদে রেখে ভক্তি।
লিখিতে আরম্ভ কর হবে তোর শক্তি।।
.....
লিখিতে পারিবি গ্রন্থ তোরে দিনু বর।।
.....
দশরথ বলে বাক্য লঙিঘও না আর।
মৃত্যুঞ্জয় দিল বর আমার সে বর।
আমার রচিত গান আছে তোর সোনা।
তাতে পদ গাঁথা আছে তারক রসনা।।"[৯]

গোস্বামী গোলকচন্দ্র তারকচন্দ্র সরকারকে গ্রন্থ লেখার মূল বিষয়বস্তুর নির্দেশ করেছেন এভাবে—

"পূর্ব্বে ছিল মুনিগণ করতিেন ধ্যান।
এবে সেই ধ্যান হয় জ্ঞানেতে বিজ্ঞান।।"[১০]

এই ধ্যান যোগের দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞাত হতেন মুনিগণ তুমিও সেই ধ্যান যোগ অবলম্বন কর সত্যের জ্ঞান লাভের জন্য। জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত সত্য জ্ঞাত হওয়া যায়।

তবেই তো তুমি সেই মহাগ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হবে। অজ্ঞান, অবিদ্যা নাশের উপায়ও বলেছেন গোলকচন্দ্র তারকচন্দ্র সরকারকে। তারকচন্দ্র সরকারকে প্রভুর মহিমা রচনায় এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন—

"শ্রীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।
লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে।।
যা দেখিস যা শুনিস তাহাত লিখিবি।
না দেখিলি না শুনিলি কেমনে পারিবি।।
কোন ঠাই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।
আরোপে দেখিবি হরি চরণার বিন্দ।।
অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে অত্রানন্দ।
হৃদয় আসিয়া লেখাইবে হরিচন্দ্র।।"[১১]

সমসাময়িক সকল হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় ভক্তগণ তারকচন্দ্র সরকারকে ভালো বাসতেন। সকলেই ভালো বাসতেন হরিচাঁদ ঠাকুরকে। সকলের সম্মিলিত শুভ ভাবনার শুভ আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে তারকচন্দ্র সরকারের শিরে। তারকচন্দ্র সরকার ভয় পাওয়ার জন্য গোলকচন্দ্র সরকার সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরী রূপে অবস্থান করতেন । বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য যেন তারকচন্দ্র সরকার চিন্তিত না হয় সে জন্য গোলকচন্দ্র তারকচন্দ্র সরকারকে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বলেছে যে দেশ ভাষা বাংলাতেই পুস্তক রচনা করার জন্য। যাতে দেশের ছোট বড় সকল বয়সের মানুষে বুঝতে পারেন। তারকচন্দ্র সরকার সেই ভাব ভাষায়ই গ্রন্থ রচনা করেছেন। গোলকচন্দ্রের আশীর্বাদ বাক্যটি তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"যে লেখা যে পড়া জান তাহা উখাড়িয়া।
দেশ ভাষা মতে দেও পুস্তক রচিয়া।।
যুবা বুড়া সবে যাতে বুঝিবারে পারে।
সেই মত লিখে দাও আমাদের বরে।।"[১২]

তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন সাধক কবি। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার মতুয়া ধর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ তাঁর জীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মহাগ্রন্থ তৎকালীন যুগের বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং পণ্ডিত মানুষের

ধর্ম জগতের এক মহামূল্যবান দলিল।

কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার তাঁর এই মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছেন বাংলা ভাষায়। কবির ভাষা পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে। কবির ভাষায় যে ভাবকে ব্যক্ত করেছেন সেই ভাব কখনো নিরস কঠিন হয়নি। কবি সহজ সুন্দর ভাবে কাব্যিক ভাষায়, কাব্য সুসমায় সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পয়ার ত্রিপদীর ভাষায় এত সাবলীলভাবে তিনি কাহিনি বর্ণনা করে ভাবকে ব্যক্ত করেছেন কখনো কোন অংশে শব্দের অপপ্রয়োগ হয়নি বললেই চলে। কবি কোথাও ভাষায় কোন কুরুচিপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করেন নি। কবির সময় যে সমাজের অবস্থা ছিল বিদ্বেষপূর্ণ তবুও রচনা নৈপুণ্যের জন্য কোথাও তা তীব্র ভাবে ব্যক্ত হয়নি। ধর্ম গ্রন্থের যে ভাষা মার্জিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন কবি। কোথাও কোথাও প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করলেও তা ভাবের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে যে ভাষার ব্যবহার তিনি করেছেন তা হল—

<u>পয়ার</u>

''ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে দয়াল ঠাকুর।
চলিলেন সাহেবের কুঠি জোনা সুর।।
মৃদ্ধৌত মার্জিত কেশ বেঁধে রেখেছিল।
অর্দ্ধপথে গিয়া সবে চুল ছেড়ে দিল।।
উড়িছে চিকুর যেন ঠিক ব্যোম-কেশ।
চলিল কবরী ছাড়ি বিশে দরবেশ।।
আগে যায় বিশ্বনাথ নাচিয়া নাচিয়া।
তার পিছে নেচে যায় গোবিন্দ মতুয়া।।
মাঝে মাঝে গোবিন্দ মতুয়া দেয় লম্ফ।
জ্ঞান হয় তাহাতে হতেছে ভূমিকম্প।।
.....
পশ্চিম দিকেতে প্রভু করেছে গমন।
মুখ পদ্মে ঝলসিছে সূর্য্যের কিরণ।।
রক্তবর্ণ চক্ষু কাল ফণী মণি ঘেরা।

ভুরু ধনু মণি রক্ষে দিতেছে পাহারা।।

ভালে ফোঁটা শশী ছটা হয়েছে সংযোগ।

তাহাতে ঘটেছে যেন পুষ্প বন্ত যোগ।।''[১৩]

কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে যে 'ত্রিপদী'র ব্যবহার করেছেন সেই বর্ণনা এখানে তুলে ধরলাম—

'দীর্ঘ-ত্রিপদী'

''বসতি অযোধ্যাধাম শ্রীরাম ভরত নাম,

বিপ্র কুলোদ্ভব মহাশয়।

বৈষ্ণবের শিরোমণি মহাসাধু তপমণি,

সর্ব্ব জীবে সমদয়া রয়।।

....

.....

ঠাকুর বলেন তায়, তোমার ঘর কোথায়,

কোথা হতে এলে মহাশয়।

কহিছে রামভরত জান প্রভু ত্রিজগৎ,

দুঃখী দেখে চেননা আমায়।।

প্রভু হরিচাঁদ কয়, থাক থাক মহাশয়,

যতদিন লয় তব মন।

যাহা ইচ্ছা তাই খাও, যাহা ইচ্ছা তাই লও,

কর সদা শ্রীহরি সাধন।।''[১৪]

আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা যথার্থ ভাবেই সর্বাংশে সত্য। কবিরব মহানন্দ হালদারের ভাষা সম্পর্কিত আলোচনাটিকে গ্রহণ করলাম—

''শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া ছিলেন নিখিল জীবের কল্যাণের জন্য

সুতরাং তাঁহার আদর্শও লীলা কাহিনি যাহাতে 'যুবা বুড়া' সকলেই

বুঝিতে পারে সেই ভাষা লিখিত হওয়া সর্ব্বতো প্রকারে সুসঙ্গত

ও সুন্দর হইয়াছে। .... বহুস্থলে কবিতার ভাব ও ভাষা ও ছন্দের মুর্চ্ছনায়... কবি এমন এক একটি স্বপ্ন লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে আমাদিগের সংসার তাপ জ্বালা দগ্ধ চিত্তকেও অন্ততঃ কিছু কালের জন্য এ মর জগত হইতে এক শান্তিময় রাজ্যে লইয়া যায়। এই মহা গ্রন্থের একটি বিশেষ মাধুর্য এই যে গ্রন্থের যে কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে মনে হইবে যেন রৌদ্ধদগ্ধ প্রান্তর হইতে ছায়া শীতল বটের তলে আসিয়া বাঁচিলাম। দেহ মন জুড়াইয়া গেল!! ইহা এমনই শান্ত ও শীতল! এমনই মধুর!!! কেন এমন হয়? ইহার কারণ এই যে ভক্ত কবি তাঁহার সারা প্রাণের ভক্তি রস দিয়া এই মহাগ্রন্থের প্রত্যেকটি অক্ষরকে এমনি ভাবে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা স্পর্শ করিলেই এক অদৃশ্য রসশক্তি আমাদিগের মরুহৃদয়কেও সিক্ত করিয়া দেয়! এ যেন শৈত্যের লীলাভূমি দার্জিলিং-এর 'অদৃশ্য' মেঘের বারিবর্ষণ।''[১৫]

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' মহাগ্রন্থের মধ্যে কবি যেমন তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা, ধর্মীয় সংকট, মানুষের কৃষিজীবন চিত্রের নিটোল বর্ণনা করেছেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ সাহিত্যে তৎকালীন মানুষের প্রতি জমিদারের অত্যাচারের বিবরণ ধরা পড়েছে। শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবেই নয় এই সময়ের সমাজ বাস্তবতার চিত্র গ্রন্থটিতে পরিপূর্ণ ভাবেই রয়েছে।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলী ও তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রের রূপায়ণ করেছেন আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয় 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে। গুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থের ভাষাও বাংলা। আচার্য মহানন্দ হালদার মহাশয় ছিলেন কর্ম জীবনে অ্যাডভোকেট। ফলে তার কবিত্ব শক্তির সঙ্গে রয়েছে সমাজ বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র। গুরুচাঁদ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবন ও কর্মজীবন বর্ণনার পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন নমঃজাতির অতীত অনালোকিত ইতিহাস তেমনি রয়েছে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নিদর্শন স্বরূপ দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা। কবি কাব্য ভাষায় পয়ার, ত্রিপদী ছন্দের মাধ্যমে ঘটনাবলীর পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি কবিত্ব শক্তির বিকাশও রয়েছে অসাধারণ। কবি শেখর মহানন্দ হালদার মহাশয়ের

মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' থেকে কিছু অংশ তুলে ধরলাম তার প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ। কবি কালের বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''বসন্ত আসিল নিয়ে ফুল রাশি রাশি।
আকাশে হাসিল চন্দ্র মধুময় হাসি।।
মলয় সমীরে যেন জুড়াইল প্রাণ।
শাখে শাখে যত পাখি কণ্ঠে ভরা গান।।
আলোকে উজল ধরা ভরা গন্ধে গন্ধে।
বিশ্ববাসী মত্ত যেন মিলন আনন্দে।।
রে কাল! নিষ্ঠুর তুই বড়ই কঠিন।
আপনার মনে চলে গেলি চিরদিন।।
তোরে নাহি ব্যথা দেয় শিশুর ক্রন্দন।
জননীর দুঃখে তোর ঝরে না নয়ন।।
সতীর বেদনা চোখে নাহি পড়ে তোর।
দুরন্ত ডাকাত তুই আপনাতে ভোর।।
নিয়তি নামিনী তোর নিয়ত সঙ্গিনী।
ভাঙা গড়া নিয়ে খেলে দিবস রজনী।।
ইঙ্গিত করিলে তুই আর রক্ষা নাই।
সোনার বাগান পুড়ে হয় ভস্ম ছাই।।
রে কাল! দংশন তোর কত ভয়ঙ্কর!
পলকে আলোর বুকে দিস অন্ধকার।।
.....
.....
সোনার কমল পড়ে অকালে ঝরিয়া।
চোখের সুমুখে মণি নিসরে হরিয়া।।
তাই বলি কাল তুই কত যে নিষ্ঠুর।
তোর বুকে গাঁথা শুধু বেদনার সুর।।''[১৬]

‘শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত’ গ্রন্থ থেকে ‘ত্রিপদী’ ছন্দের পরিচয় গ্রহণ করব। এই ছন্দের মধ্যে যে ভক্তি ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি তেমনি আর একটি মহাসত্য লুকিয়ে রয়েছে এই ‘ত্রিপদী’ পদের মধ্যে। যার নাম কবি বিচরণ পাগল। বিচরণ পাগলের রচিত দুইখানি গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণ করব এরপর। বিচারণ পাগল গুরুচাঁদ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত সাধক ও শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর নিত্য সঙ্গী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মতুয়া মূল আকর গ্রন্থগুলির লেখক সকল ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক প্রিয় ভক্ত হিসাবে পরিগণিত। এই ‘ত্রিপদী’ ছন্দের কবিতার বর্ণনার মধ্যে সেই সত্য যেমন নিহিত ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতি ভক্তের প্রাণের আকুতিও ব্যক্ত হয়েছে। কবি শেখর মহানন্দ হালদারের বর্ণনাটি হল—

‘‘শ্রীযাদব মহাভাগ প্রাণে গাঢ় অনুরাগ
মনে ভাবে বৃথা মোর জীবন ধারণ।
বাঞ্ছাপূর্ণ নাহি হল প্রভু গৃহে নাহি গেল
কোন পাপে এ ঘটিল বুঝি না কারণ।।
বিচরণ পাগলেরে ডেকে নিয়ে একান্তরে
তার দুটি করে ধরে আঁখি জলে ভাসি।
পরাণে দারুণ ব্যথা, যাদব না বুঝিল তা,
মনে প্রাণে তাই ব্যথা হ’ল আর বেশী।।
বলে শোন বিচরণ জানিস ত’মোর মন
.....
....
.....
জনমের মত তাই সকলে ছাড়রে ভাই
দেশ ছেড়ে চলে যাই অচেনা বিদেশে।
গুরু মোর হল বাম পূর্ণ নহে মনস্কাম
বেঁচে কেন রহিলাম বল কার আশে?
এক কথা বলি শোন পাগলারে বিচরণ

জানি তোরে গুরুচাঁদ করে বহু দয়া।

তুই যদি জোর করে মোর ঘরে নিস তাঁরে

বুঝিব আমার পরে আছে তোর মায়া।।”[১৭]

আচার্য মহানন্দ হালদার পয়ার ত্রিপদীতে এই মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও কার্যাবলীর পরিচয় দিয়েছেন ‘শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত’ গ্রন্থে মহানন্দ হালদার। মহানন্দ হালদারের ‘শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত’ গ্রন্থের যে সমালোচনা করেছেন প্রকাশক শ্রীকুমুদরঞ্জন মজুমদার তা থেকে আলোচনার সুবিধার্থে কিছু অংশ তুলে ধরলাম। তা হল—

“গ্রন্থখানি আদ্যে প্রান্ত পাঠ করিয়া আমার প্রাণে যে ধারণার উদ্ভব হইয়াছে তাহাই সর্ব্ব সাধারণ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম এবং আমি আশা করি পাঠকগণ আমার সহিত এ বিষয়ে সানন্দ চিত্তে একমত হইবেন। গ্রন্থকার কবি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং কাব্য লক্ষ্মীর পূজাদেবী মূলে এই তাহার প্রথম অর্ঘ্য। মানস-নন্দন-কানন জাত পারিজাত স্তবকে তিনি যে অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন তাহা সত্য সত্যই অতুলনীয় হইয়াছে। কোন কোন অধ্যায়ের মধ্যে এমন সুনিপুণভাবে তিনি লেখনী চালাইয়াছেন যাহাতে মনে হয় যেন কোনও ভক্ত পূজারী তাহার ‘প্রাণের দেবতার’ সম্মুখে অশ্রু জলের মধ্য দিয়া আপনার ‘ব্যথার পূজার’ গান গাহিয়া চলিয়াছে!! ইহা এমনি জীবন্ত!! এমনিই মূর্ত্তিমন্ত!! আবার কোন কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে এমনই মনে হইয়াছে যেন সংসার তাপদগ্ধ জীবনকে দূরে ফেলিয়া কোন ছায়া-সুনিবিড় তপোবনে ঋষির মুখে তত্ত্ব কথা শুনিতেছি!! কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে কোন অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে ‘মানুষে মানুষে হিংসা’ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি, পরন্তু কোন অধ্যায়ের নির্দোষ হাস্যরসের মধ্যে প্রভূত আনন্দ লাভ ও করিয়াছি। এই রূপে সর্ব্বনীতির পূর্ণ প্রতীক শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের জীবন আলেখ্যের মধ্যে ভক্ত কবি সর্ব্বরসের

অবতারণা করিয়া পূজার নৈবেদ্যকে ষোড়শোপচারে পূর্ণাঙ্গ
করিয়াছেন। .... শুধু তাহাই নহে বাংলা ভাষায় ও এই প্রকারের
রসযুক্ত সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ খুব কমই রচিত হইয়াছে।''[১৮]

প্রকাশকের গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত সম্পূর্ণভাবেই সত্য। আর যে কোন ব্যক্তি মানুষ এই মহাগ্রন্থ পাঠ করলে বুঝতে পারবেন সাহিত্যের যথার্থ মূল্যকে। কবিবর মহানন্দ হালদার শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনী যেভাবে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন তা সত্যই মহামূল্যবান। বিচরণ পাগলের দুই মহাগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই বলতে হয় এই কবিও পয়ার, ত্রিপদীর ছন্দই ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্য গ্রন্থে।

বিচরণ পাগল ও অশ্বিনী গোঁসাই, গোপাল সাধু ও আরো বহু অগণিত ভক্ত যারা হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শ ধর্মাদর্শের সমসাময়িক ভক্ত কবিগণ হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় মানুষ ছিলেন। বিচরণ পাগলের 'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা' থেকে ভাষার পরিচয় গ্রহণ করার জন্য যে উদাহরণ গ্রহণ করলাম সেখানেই যেমন ভাষা প্রসঙ্গ পাব তেমনি গুরুচাঁদ ঠাকুরের দুই প্রিয়ভক্ত অশ্বিনী গোঁসাই ও বিচরণ পাগলের কথাও রয়েছে। কবিবর বিচরণের গ্রন্থে রচনা রীতির পয়ারের পরিচয় হল—

''দেশ শুদ্ধ লোকে যেন গণিল হুতাশ।
অশ্বিনীর তরে যেন বাড়ে হা হুতাশ।।
একদিন বিচরণ পাগল যে জন।
গুরুচাঁদ পাশে গিয়ে দেন দরশন।।
প্রভু বলে বিচরণ জান কি সে কথা।
আমার অশ্বিনী নাকি চলে গেছে কোথা।।
কোন দেশে গেল বল কিসের লাগিয়া।
আসিবেন না আর নাকি এদেশে ফিরিয়া।।
ফিরে যদি না আইসে কি হবে উপায়।
অশ্বিনীর তরে মম হৃদি দগ্ধ হয়।।
অতএব বিচরণ চলি যাও ত্বরা।

দেখ গিয়ে কোন দেশে পাও তাঁর ধরা।।

.....

কোন স্থানে সুস্থ নহে থাকে মন প্রাণ।

অনুক্ষণ কাঁদে কোথা প্রভু গুরুচাঁদ।।

বহু কষ্টে উপনীত হইল দেশেতে।

প্রভু পদে প্রণমিল কাঁদিতে কাঁদিতে।

প্রভু বলে ও অশ্বিনী কোথা গিয়েছিলে।

কোন দেশে কহ বাপ কিবা দেখে এলে।।''[১৯]

ত্রিপদীর উদাহরণ কবির বর্ণনায়—

''পরে অপরাহ্ন কালে সব ভক্তগণ মিলে,

চলে প্রভু জয়পুর দিকে।

প্রভুর অপার লীলা মরি কিবা মধুর খেলা,

ভকতের গন সকৌতুকে।।

দৌড়ে গিয়ে শ্রীশৈলেশ শয্যার করে সুবেশ

প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিল।

সঙ্গেতে সাধনা চলে, ভাসিতেছে আঁখি জলে

জয়পুরে উদয় হইল।।

রসনার গৃহ মাঝ মহাপ্রভু রসরাজ,

বসিলেন হরিষ হইয়া।

প্রভু পদে প্রণমে আসিয়ে।।''[২০]

বিচরণ পাগল রচিত 'শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা' মহাগ্রন্থ। বিচরণ পাগলের এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণের কার্যাবলীর পরিচয় রয়েছে ও তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির পরিচয় রয়েছে যা সমাজের সমাজ বাস্তবতার চিত্র। বিচরণ পাগল গুরুচাঁদ ঠাকুর যেভাবে মানুষকে ধর্ম কর্ম শিক্ষা দান করেছেন সেই সকল বিষয়ই তিনি 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্যে' বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্তাকারে। এই গ্রন্থেটিতেও পয়ার, ত্রিপদীর ব্যবহার করেছেন। বিচরণ পাগলের দ্বিতীয় গ্রন্থে কবি যে ভাবে ভাষার প্রয়োগ করেছেন তা

হল—

পয়ার

''দয়াময় গুরুচাঁদ জীবের লাগিয়া।
স্বধর্ম শিখায় জীবে করুণা করিয়া।।
.....
.....
পরহিতে কর্ম করা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।
কভু না চাহিবে কিছু তার বিনিময়।।
স্বার্থ শূন্য মহাকর্ম্ম মহতের রীতি।
কামনা বাসনা শূন্য সে উত্তম গতি।।''[২১]

'ত্রিপদী'র উদাহরণ 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্যে' থেকে তুলে ধরছি—

''মাধুর্য্যের ভক্ত যারা, গোপনেই থাকে তারা,
ঐশ্বর্য্যের আবরণ দিয়ে।
সাধারণ লোক হতে রহে সদা গোপনেতে,
আপনার স্বধর্ম লাগিয়ে।।
মুক্তিকামী নহে তারা, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা,
সদা থাকে আত্মগোপনেতে।
সাধারণ লোকে যত, মানে না তাহার তত্ত্ব,
বাহ্যভাবে সদা থাকে মেতে।।
অন্তর্দ্দর্শী হলে পরে, তবে সে চিনিতে পারে,
এই ভবে মানুষ রতন।''[২২]

'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্যে' বিচরণ পাগল তত্ত্বকথাকে বেশি বলেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর যেমন ছিলেন সমাজ সংস্করক তেমনি ধর্ম সংস্কারক। তিনি যে পিতার কর্মকে আরো সুদৃঢ়ভাবে জন সমাজে প্রকাশ ঘটান কর্মের মাধ্যমে এই পরিচয় দিয়েছেন বিচরণ পাগল ও সকল লেখকগণ।

ধর্ম সমন্বয়ী ভাবধারা ও গানের আলোচনা :

'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের প্রথমেই রয়েছে ভক্তি ধর্মের প্রতি উদার মানসিকতার পরিচয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটি ভক্তের ভগবান চিরকালের তাঁর আদি অন্ত নেই, তিনি অসীম অনন্ত, তিনি কালাকালের সীমায় আবদ্ধ নন। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুর রূপে আবির্ভূত হয়েছেন ভক্তের মাঝে। প্রথমেই কবি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''হরিচাঁদ চরিত্র সুধা প্রেমের ভাণ্ডার।
আদি অন্ত নাহি যার কলিতে প্রচার।।''[২৩]

'হরি' যার কোন সীমা নেই সেই অসীম অনন্ত করুণাময় ভগবান। তিনি মানবদেহধারী হয়েছেন।

এই বর্ণনার পরেই কবি বর্ণনা করেছেন ভক্তি যোগের গূঢ়ার্থ। অর্থাৎ ভক্তিই হল ভক্তের পরিচয়। যে যাকে ভক্তি করে সে তার ভগবান এই উদার ভক্তিভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

''যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।
ভক্তি যোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।''[২৪]

কোন মানুষকেই হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ধর্মীয় ভাবনায় বাধা দেন নি। এমনকি সকল হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণও এই আদর্শ পালন করে থাকেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনা প্রবর্তনের আগে সমাজে যে ভক্তি ভাবনা সমাজে প্রচলিত ছিল সেই ভক্তের প্রতি ও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই কবি হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবির বর্ণনায়—

''সকল হরণ করে তারে বলি হরি।
রাম হরি কৃষ্ণ হরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।
.....
হরিচাঁদ আসল হরি পূণানন্দ হরি।।''[২৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন পূর্ণ মানবতাবোধের মূর্ত প্রতীক। তাঁর মানুষের প্রতি ভাবনাও ছিল মৈত্রী ভাবনায় মিলনের প্রতীক। তাই কবির বর্ণনায় ধরা পড়েছে—

''শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।
.....

জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।।''[২৬]

সারাজীবন ধরে মানুষের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত ছিলেন এবং পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকেও সেই কল্যাণ কর্মে নিয়োগ করেছেন তিনি নিজেই। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিই প্রধান। তাই ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন ভগবান। একেবারে একান্ত আপনার জন। কোন ভেদাভেদ তিনি করেননি কখনো।

গান মানুষকে মুগ্ধ করে। গান মানুষের প্রাণের সুরের প্রকাশ। ভগবানের কাছে মনের ভাবকে সুরের সহযোগে নিবেদন করেন ভক্ত মানুষেরা। মতুয়া ধর্মেও রয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে রচিত অগণিত গানের সম্ভার। ভক্তিগীতি প্রাণের মনের বিশুদ্ধ ভাবের জাগরণ ঘটায়। ভক্তিগীতির মাধুর্য্যই মানুষকে প্রাণরসে ভরপুর করে তোলে। বাংলা ভাষায় রচিত মতুয়া ধর্মসাহিত্যগুলি বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি মতুয়া সঙ্গীতগুলিও ভক্তিগীতি হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভক্তগণ গানের মাধ্যমে ভক্তির শ্রদ্ধার্ঘ যেমন নিবেদন করেছেন তেমনি ব্যক্ত হয়েছে ভক্তির মহিমা। ভক্তির দ্বারাই মানুষ দেহের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। সেই কথাই কোথাও ব্যক্ত হয়েছে। মূলত এই ভক্তি গীতির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে ভক্তির, জ্ঞানের সঞ্চারের মধ্যে দিয়ে আত্মচেতনা লাভ করে মানুষ মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হন। অশ্বিনী কুমার সরকার একজন মহাপ্রেমিক ভক্ত সাধক। যার জন্য স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুর কেঁদেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর এই মহাভক্তকে মহারত্ন আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এই মহারত্ন অশ্বিনী গোঁসাই 'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত' রচনা করেছেন। অশ্বিনী গোঁসাই সম্পর্কে ড. পরমানন্দ হালদার যথার্থই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—

> ''সাধক কবি শ্রীমৎ অশ্বিনী গোঁসাই মতুয়া ধর্মও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড বিস্ময়।... তিনি কীভাবে ঐশ্বরিক শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে অসংখ্য গীতি মাল্য রচনা করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত' তার জ্বলন্ত নিদর্শন। কীভাবে, কি ভাষায়, কি কবিত্বে এবং কি আধ্যাত্ম সাধনায় তিনি ছিলেন আত্ম সমাহিত এক মহাকবি।''[২৭]

সাধক কবি শ্রীঅশ্বিনী গোঁসাই ভাব জগতের পরিমণ্ডলে অনেক গান রচনা করেছেন

এবং সেগুলি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত। অশ্বিনী গোঁসাই এর রচিত গানগুলি সম্পর্কে আচার্য মহানন্দ হালদার বলেছেন—

''প্রেমতত্ত্ব ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব গাঁথা।
আত্ম তত্ত্ব সমাহিত গানের কবিতা।।''[২৮]

অশ্বিনী গোঁসাই-এর কিছু গানের উল্লেখ করলাম যেগুলির আধ্যাত্মিক সুরই মূল বিষয়। এই ভাবের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হল—

প্রভাতী গীতি

ক. 'প্রাণমতি শুকশারী, পোহাল শর্ব্বরী, শ্রীহরি মঙ্গল গাও হে।
শ্রীহরিমঙ্গল গাও হে' প্রেমানন্দে মাতিয়া রও হে।।

১. হৃদি নিধু বনে, শান্তি মায়ের সনে শ্রীহরিচাঁদকে জাগাও হে।
যুগল মিলন করি, যুগল নয়ন ভরি, হরিরূপ-রসে ডুবে রও হে।।

২. নিশি হল ভোর, রসনা ভ্রমর, গুণ গুণ স্বরে গুণ গাও হে।
হরিপদ পঙ্কজে, সতত থাক মজে, হরি পদ রজে গড়ি দাও হে।।

৩. হরিরূপ আলোকে, মনের পুলকে, নিরানন্দ উলুকে তাড়াও হে।
হইয়া চৈতন্য, এ দেহ কর ধন্য, সাধু সঙ্গ বাতাস লাগাও হে।।

৪. নিশি প্রভাত সময়ে, প্রেমানন্দ হৃদয়, পুলকে পুর্ণিত হও হে।
আলস্য ত্যজিয়া, হরিপদে মজিয়া, হরিচাঁদ প্রভাতী গাও হে।।

৫. হরিপদ পল্লব, দেবের দুর্লভ, কায়মনে স্মরণ লও হে।
শয়নে স্বপনে, জাগরণে বদনে, নামমধু পানে মত্ত হও হে।।

৬. তারক মহানন্দ, গোঁসাই গোলকচন্দ্র, প্রেমধন যাচে জীবে লও হে।
হেন দয়াল ভবে আর কি খুঁজিয়া পাবে, চরণে শরণ লও হে।।

৭. শ্রীগুরুচাঁদ বলে, নিশি প্রভাত কালে, আলস্যে অবশ কেন হও হে।
(অলস) অশ্বিনী অধম, ত্যজিয়া মায়া ঘুম, বসিয়া হরিগুণ গাও হে।।''[২৯]

মতুয়া ভক্তগণ প্রভাতী গীতি হিসাবে অশ্বিনী গোঁসাই এর এই গানটি গেয়ে থাকেন। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সূর্যদয়ের প্রাক্কালে এই গানটি মতুয়াভক্ত গায়কগণ প্রাণ মাতানো সুরে যখন করেন তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্ফুরণ ঘটে ভক্ত হৃদয়ে। সমবেত সকল ভক্তগণই

সমবেত কণ্ঠে গুণগুণ স্বরে সুর মেলানোর চেষ্টা করেন। ভোরের এই অবর্ণনীয় মাধুর্য্যের বিকাশের সময় এই ভক্তিগীতি ভক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় যখন তখন ভোরের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

অশ্বিনী গোঁসাই ভাব জগতের অধিবাসী ভাবই তাঁর সঙ্গীতের উপজীব্য। শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের তত্ত্বের সার্থক রূপকার তিনি। তাঁর গানগুলির মধ্যে এই কোলাহলময় অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির এক নব দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে। সংসারে বসবাস করেও কীভাবে নিস্পৃহ জীবন যাপন করতে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবির অনেক আধ্যাত্মিক গান। কীভাবে নিরবে ভগবানের সাধনা করতে হয় তার নিদর্শন কবির এই গান—

খ. ''মনের মানুষ ধরা, মন রে ফেরা মুখের কথা নয়,
তাঁরে ধরবি যদি নিরবধি, (নে) বধিরান্ধ বোবাশ্রয়।।''

১. বধিরান্ধ বোবার স্বভাব ধর, তবে অধর ধরা পড়বে ধরা, তারে ধরার মত ধর।
থাক যুতের ঘরে রূপ নিহারে, তবে মানুষ পাওয়া যায়।।

২. আমিত্ব দূর যখন হবে, তবে হবে সে ভাব, বাহ্য স্বভাব, কিছু না রবে।
এই দশা তোর যখন হবে, দেখবি জগৎ মানুষ ময়।।

৩. মনের মানুষ যদি ধরতে চাও, আত্মস্বার্ত ত্যজে প্রেমে মজে অনুগত হত।
হলে অনুগত, মনের মত, মন মানুষ হবে সদয়।।

৪. প্রেম নগরে হয় তার বসতি, ও সে প্রেমিক বড় ভালোবাসে, প্রেমে যাঁর আর্ত্তি।
ও সে প্রেমিক পেলে করে কোলে, প্রেম শূন্য দেখিলে লুকায়।।

৫. ডেকে বলে তারক রসনা, আমার মনের মানুষ হরিচাঁদ তার কর উপাসনা।
এবার অশ্বিনীর পুরবে বাসনা মহানন্দের করুণায়।।''[৩০]

অশ্বিনী গোঁসাই এর এই গানটিতে মানুষের 'নাম' করার পর মানুষের যে মহাভাবের উদয় হয় সেই বর্ণনা করেছেন। অশ্বিনী গোঁসাই ছিলেন প্রেমিক কবি অর্থাৎ হরি ভক্তির, প্রেমিক মহারত্ন। তাই সেই মহাভাবের বিকাশ ঘটেছে তার গানগুলিতে। সেই রকমই একটি গান হল এটি—

গ. ''এ মহাদেশে, তার হরির অভাব কিসে,
ও যার চরিত্র—পবিত্র হৃদয়, সদা প্রেমানন্দে ভাসে।।''

১. জলে হরি, স্থলে হরি, হরি হৃদয় বাসে।।

ওরে অনলে অনিলে হরি, হরি রূপ রসে গেছে মিশে।।

২. যাঁর হরি কথা হৃদয় গাঁথা, তার তুলনা কিসে।

ও সে হরি কথা কইতে কইতে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে।।

৩. হরিনামামৃত অবিরত, পান করে যে বসে।

হয়ে নামে রুচি সর্ব শুচি, নেচে বেড়ায় বেহাল বেশে।।

৪. হয়ে নামে নিপুণ, নিদ্রা মৈথুন, তাড়িয়েছে দূর দেশে।

হয়ে পাগল পারা, মাতোয়ারা, একবার কাঁদে একবার হাসে।।

৫. মহানন্দ পাগলা ছন্দ প্রেম দিয়ে কাম নাশে।

অশ্বিনী তুই রইলি ভুলে, হরি প্রেম ঘটল না তোর কর্ম্মদোর্ষে।।''[৩১]

হরিচাঁদ ঠাকুর আধ্যাত্মিক ভাবের পথিক মানুষকে দিয়েছেন তাঁর চির সাধনার সাধ্য বস্তুকে। আর সামাজিক দুঃখ-কষ্টময় মানুষকে দিয়েছেন ধর্ম কর্মের সমন্বয়ে আদর্শ গৃহধর্ম। আর রোগীকে দিয়েছেন রোগমুক্তি, সাধক প্রেমিক ভক্তকে দিয়েছেন বিশুদ্ধ মানব প্রেমের নির্যাস। সকল সামাজিক মানুষের কল্যাণ কর্ম করেছেন তিনি। অশ্বিনী গোঁসাই-এর এই গানটি ব্যক্ত হয়েছে—

ঘ. ''হরিচাঁদ, হেরে জীবন জুড়াল,

ও প্রেম রসে হারে জগৎ মাতালো।''

১. দুঃখী তাপীর জুড়াতে জীবন, ওড়াকান্দী হরিচাঁদ এবার করলেন আগমন।

তোরা দেখসে আসি, জগৎবাসী, হরিচাঁদ উদয় হলো।।

২. নব রসে শ্রীঅঙ্গ মাখা, অধরে সুধাকর ও তার দুনয়ন বাঁকা।

সে যে ব্রজ নাটুর প্রাণ সখা, ভাবেতে বোঝা গেল।।

৩. শান্তি মায়ের হৃদয়েরই ধন, যোগে পায়না যোগীগণ, তারা করে যোগ সাধন।

তারে পাবার লাগি সর্ব্বত্যাগী, হীরামন পাগল হলো।।

৪. কি দিব তার রূপের তুলনা, গগনে চাঁদ মলিন হয়, হেরে রূপের জ্যোৎস্না।

এবার পুরাতে জীবের বাসনা হরিচাঁদ ভবে এল।।

৫. ডেকে বলে তারক রসনা, আমার মনের মানুষ হরিচাঁদ তার কর উপাসনা।

দয়াল মহানন্দের এই বাসনা, অশ্বিনী ধামে চলো।।''[৩২]

মতুয়া ধর্মের মূল বিষয় মানুষের উন্নতি সাধন। 'মানুষেতে নিষ্ঠা' হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অটুট বন্ধন সর্বদা রক্ষা করা হয় মতুয়া ধর্মে। এর বাস্তব সত্য মানবতার আত্মপ্রতিষ্ঠা পূর্ণভাবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মানবতার উদ্বোধন এবং মানুষের ধর্মের উদ্‌যাপনে উদার মনের শুদ্ধশীল স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''এই সার্বজনীন মনের উত্তোরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করতেই মানুষের অভিব্যক্তি উৎকর্ষ। মানুষের আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই বৃহৎ মানুষের সাধনা, এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশে নানা সমাজের নানা মত, অন্তরে আছে এক মানব।''[৩৩]

তাই সত্যের আধারে ব্যক্তি মানুষ নয়, বিশ্বগত মানুষের একাত্ম হয়ে ওঠাই ধর্ম। তাই সর্বকালের ইতিহাসে দেখা যায় প্রেমিকগণের অভিপ্রায় হল সহজ মানুষ হওয়া। বাইরের ভেদাভেদ পরিত্যাগ করে অন্তরের ঐক্যের মধ্যে ফিরে যাওয়া। সেখানে বৈচিত্র থাকলেও কিন্তু বিরোধ নেই, এই অন্তর সত্যের মন্দিরেই জ্বলছে সাধনার নিত্যদীপ। অন্তরের শুদ্ধ আলোক ধারায় পরিশুদ্ধ হয়ে উঠলেই মহামানব সত্ত্বায় উত্তীর্ণ হয়। আর তখনই মানুষ সহজ সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দর মানুষের কথাই ব্যক্ত করেছেন 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন' গানের বইয়ের গানগুলির মধ্যে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। কবির বর্ণনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিচয় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

ঙ. ''তোরা দেখসে এক সোনার মানুষ এসেছে।
মানুষ কোন দেশে ছিল কার কাছে।
.....
.....
সবে বলে হরি হরি, মানুষের জন্য কাঁদতেছে।।
.....
আমার হরিচাঁদ সেই প্রেমের মানুষ, বিশুদ্ধ সহজের মানুষ,

কলির মানুষ করতে মানুষ মানুষের করণ দিতেছে।''[৩৪]

মানুষের মধ্যেই সর্বগুণ নিহিত। মানুষের ধর্মের জন্য তীর্থ পর্যটনের প্রয়োজন নেই। বিশ্বের সব সত্যই মানুষের অন্তরে নিহিত রয়েছে। সেই অন্তরনিহিত জ্ঞানালোকের বিকাশেই পূর্ণতা পায় মানুষ। আর সেই জ্ঞান ভক্তির বিশুদ্ধ ভাবকে অর্জন করার জন্য সেই জ্ঞানালোক প্রাপ্ত মানুষের প্রয়োজন হয়। সেই মানুষের সানিধ্য লাভ করলে মানুষও সেই জ্ঞানের আলোকের সন্ধান পায় ও পূর্ণ মানবতার সন্ধান পায়। সেই জ্ঞানভক্তি রতন পাওয়ার কথাই তারকচন্দ্র বলেছেন এভাবে—

চ. ''ধর গে এবার মানুষ রতন।
রতন পাবি যদি করিস যতন।।
গুরুচরণ রত্না করে আছে রতন কর সিঞ্চন।
পাবি কাঁচের পরিবর্তে কাঞ্চন পুরিবে তোর মনের আকিঞ্চন।
জ্বেলে রাগের বাতি দিবা রাতি-আলোকর দেহ নিকেতন,
আসবে আলোক দেখে, গোলক থেকে পুলকে ব্রহ্ম সনাতন।
ধরতে গেলে দেয় না ধরা, ক্ষীরোদবাসী নীরোদ বরণ,
ধরে মানুষের চরণ লগে শরণ গুরুচরণই হরিচরণ।
মহানন্দের বাক্য ধরে মহানন্দে কর সংকীর্ত্তন।
পাবি তারক ব্রহ্ম নামের গুণে হরেরে তুই অক্ষয় প্রেমধন।।''[৩৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছে তা অনন্য সাধারণ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে, আধুনিক ভাবনায় রচিত হচ্ছে গান, কবিতা ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনার আলোকে হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকথা। গানের গুরুত্ব যে অপরিসীম। গান এমন একটি প্রকাশ মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে ভক্তের সকল কথা অকপটে প্রকাশিত হয়। মতুয়া ধর্মেও গানের দিকটি রয়েছে। যেখানে নানা পর্যায়ের গান রয়েছে। উপরে আলোচনার মাধ্যমে সেই গুরুত্বকে তুলে ধরেছি।

মতুয়া ভক্তদের সামাজিক জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা:

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত সম্প্রদায়ের 'মতুয়া' নামে খ্যাতি হওয়ার পর হরিচাঁদ ঠাকুর

খাঁটি 'মতুয়া' হতে গেলে যে শিক্ষা ভক্তগণকে দিয়েছেন তা হল হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা। আদর্শ 'মতুয়া'র পরিচয় দিয়েছেন হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুর। ধর্ম ও কর্ম সম্মিলনের মাধ্যমেই মতুয়া হওয়ার কথা বলেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। কেমন হবে ভক্ত চরিত্র সেই পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে। হরিচাঁদ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্তের পরিচয় হল—

''সেই মোর শ্রেষ্ঠ ভক্ত' হরিচাঁদ ভনে।।
কর্ম্মেতে প্রধান হবে ধর্ম্মেতে প্রবল।
বাহুতে রাখিবে শক্তি চক্ষে প্রেম জল।।
.....
.....
কোমলে কঠিন হবে অপূর্ব্ব মিলন।
কুসুমের মৃদু কণ্ঠে বজ্রের গর্জ্জন।।''[৩৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুর যে ভাবে মানুষের উন্নতির জন্য অগ্রসর হয়েছেন সেই আদর্শ তিনি পিতার কাছে গ্রহণ করেছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই ভাবাদর্শকে বলেছেন—

''বিশ্ববাসী মানবের যাতে শুভ হয়।
সেই ধর্ম্ম নীতি কথা বলেছে সদায়।।
মানব গোষ্ঠীর তাতে সুমঙ্গল হবে।
নর জাতি দিনে দিনে সে ধর্ম্ম জানিবে।।''[৩৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সেই ভাবনার আদর্শ গ্রহণ করেই তিনি প্রথমে কাজ শুরু করেন এভাবে—

''দলিত পীড়িত যত বিদ্যাহীন নর।
মহা দুঃখে কাটে কাল পৃথিবী ভিতর।।
তাদের দুঃখের বোঝা বিদ্যা বুদ্ধি দানে।
দূর করে দিতে আজ্ঞা করে ততক্ষণে।।
অগ্রভাগে বঙ্গবাসী নমঃশূদ্র গণে।
উদ্ধার করিতে বলে আনন্দিত মনে।।
নিপীড়িত জাতি মধ্যে এ জাতি প্রধান।

অগ্রভাগে করি তাই তাদের কল্যাণ।।

নমঃশূদ্র সে আদর্শ করিলে গ্রহণ।

তাদেরে ধরিয়া ধন্য হবে অন্য জন।।''[৩৮]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার ভাবাদর্শকে আরও প্রসারিত করেছেন কর্মের দ্বারা। তিনি জাতি বলতে সকলকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা আদর্শ রূপ হিসাবে পরিগণিত। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জাতি সম্পর্কে শিক্ষা হল এই—

''আমি বটে জানি এই জাতির বিচার।।

.....

নর জাতি এক জাতি ভেদ করা বৃথা।।

জাতির উন্নতি যদি করিবারে চাও।

মানবের শুভ যাতে সেই পথে ধাও।''[৩৯]

মানব জাতির কল্যাণ হবে একমাত্র ধর্ম এবং বিদ্যার জ্ঞানা আলোকের মাধ্যমে। গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই বলেছেন—

''ধর্ম্ম আর বিদ্যা বিনা নাহিক উদ্ধার।।

পবিত্র চরিত্র জানি সর্ব্বনীতি সার।

ধর্ম্মে কর্ম্মে সর্ব্বখানে মান সদাচার।।''[৪০]

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বহু মানুষ এক জায়গায় পাশাপাশি সহাবস্থান করে বাস করে। তাই বহু মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে হলে সকলের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভাবে বসবাস করার মধ্যেই মানবমৈত্রী স্থাপিত হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তগণকে সামাজিক নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভক্তগণকে—

''সামাজিক নীতি সব শোন ভক্তগণ।

'জাতিভেদ' প্রথা নাহি মানিবে কখন।।''[৪১]

গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শের পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাই পিতার ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই লোকাচারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে গণ্য হলেও ভক্তের জাতি একটাই হয় তা হল মানুষ জাতি। এখানে 'মতুয়া'রা সকলেই একটি ভক্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা সকলেই এক। ড. মীডের স্ত্রী মিসেস মীডকে গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন—

''জাতি ভাগ মোর ঠাঁই পাবে না কখন।

নরাকারে ভূমণ্ডলে যত জন আছে।

'এক জাতি' বলে মান্য পাবে মোর কাছে।।

আমার পিতার ভক্ত আছে যত জন।

এক জাতি বলে তারা হয়েছে গণন।।

লোকাচারে তারা কেহ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ।

মতুয়ার মধ্যে তাহা নাহি নিরুপণ।।

.....

.....

মতুয়া সকলে এক জাতিভেদ নাই।''[৪২]

হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের মানবতাবোধের পরিচয় থেকে বোঝা যায় মানুষকে ভ্রাতৃ বন্ধনের সঙ্গে সমাজ জীবনে চলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের বৃহৎতর সমাজ সংস্কারের পরিচয় পাই শিক্ষার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুরের কর্মসূচীর সময়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সকল ভক্তগণের উদ্দেশ্যে বলেন—

''সবাকারে বলি আমি যদি মান মোরে।

অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।।''[৪৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই সমাজ কল্যাণকারী শুভ বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল ভক্তগণের মধ্যে। তারা সেই কথার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। সেদিন এবং বর্তমানকালেও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ ও কর্মদর্শকে ধর্মকর্মের মধ্যে দিয়ে সর্ব্বদাই পালন করে চলছে পুরুষানুক্রমে। এ ধারা চলবে প্রবহমান কাল ধরে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মানুষের বাস্তব জীবনচিত্রের পরিচয় মতুয়া ধর্ম সাহিত্যে :

হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনার মূল বিষয়ই হল জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে মানুষের জীবনকে পূর্ণাঙ্গভাবে সুখ শান্তিতে ভরপুর করা। মানুষের বাস্তব জীবন চিত্রেরই পরিচয় রয়েছে সর্বত্র। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ভগবানের সমতুল্য করার

গঠন প্রণালী ও কর্ম প্রণালীই শিক্ষা দেন। মানুষই ভগবান হয় তার যোগ্য কর্মানুসারে। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে দশরথ বৈরাগী যে প্রার্থনা করেছিলেন তা ঠাকুরকে ভালোবেসে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথের সেই চাওয়াকে পূর্ণ করেছিল। এবং দশরথের মনোবাঞ্ছা পুরণের পর হরিচাঁদ ঠাকুর যে কথাগুলি বলেছিলেন তার মধ্যেই রয়েছে বাস্তব সত্য। কারণ মানুষ নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্ম করে আর সেই কর্মানুসারেই ফল পায়। আর মানুষের প্রার্থনা পূরণ হয় কর্মের মাধ্যমে। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যে সকল মানুষের যাতায়াত ছিল তারা সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে মনের বাসনা পূরণের আকাঙক্ষা করত হরিচাঁদ ঠাকুর সকলেরই মনোবাসনা পূরণ করতেন অভিপ্রায় অনুসারে। সেই কথাই তিনি দশরথকে বলেন—

"দশরথ বলে যাহা চাই দিলে তাই।
প্রভু বলে আমি তোর বাসনা পুরাই।।
তোর যে ভাবনা আছে বহুদিন হতে।
ভাবিলে ভাব না সিদ্ধি পারিলে ভাবিতে।।
যে যাহা ভাবনা করে ঠাকুরের স্থান।
অবশ্য অভীষ্ট পূর্ণ করে ভগবান।।"[৪৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে ভক্ত মানুষেরা যে ভাব নিয়ে গেছেন সেই ভাবের পূর্ণ সমাধান করতেন তিনি। তিনি মানুষের অন্তরবার্তা বুঝে সেই ভাবে তাকে তার সমস্যার উপায় করতেন। আর মানুষের ভাবনার গুরুত্ব দিতেন। সেই ভাবে তিনি সকল মানুষের অগ্রগতির পথকে প্রসারিত করতেন। সেই কথা তিনি দশরথকে বলেন—

"মোর ঠাই যেই ইচ্ছা করে যেইজন।
আমি তাহা জানিতে পারি সকল কারণ।।
যে যাহা প্রার্থনা করে এসে মম ঠাই।
সেই গীত আমি তার সাথে সাথে গাই।।"[৪৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তগণের অভিপ্রায় বুঝে তার কাছে প্রকাশিত হতেন। তার অভিপ্রায়ের পূর্ণতার সন্ধান দিয়ে মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেন। এভাবে তিনি ভক্ত মানুষের প্রয়োজন অনুসারে চলতেন। এইভাবে তিনি সকলের হৃদয়ের ধন, প্রাণের ঠাকুর হয়ে সকলের মঙ্গল করতেন। এখানে অর্থাৎ হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসতেন যারা তারা সকলেই হলেন এই বাস্তব সমাজের

দুঃখ সুখের মানুষ। তাদের তিনি যেমন ভক্তি পথের সন্ধান দিয়েছেন তেমনি সমাজ জীবনকে কর্মময় করার নির্দেশ দিতেন। সেই কর্মাদর্শের সঠিক প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছেন। তখনকার বাস্তব জীবনচিত্র সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে আকর গ্রন্থগুলিতে। মহৎ মহাসাধক বলে যাদের পরিচিতি ছিলো কর্মগুণে তাদের বাস্তব জীবনের চিত্রকে আলোচনার জন্য তুলে ধরলাম।

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের কালীনগর বসতি।

মহাপ্রভুর হরিচাঁদ ঠাকুরের জোনাসুর কুঠি যাত্রা।

শ্রীধাম ওড়াকান্দির ঘাটলা বন্ধন।

অথ শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর বিবরণ।

রাম ভরতের পুনরাগমন।

রুদ্র উদ্ধার।

দেবী জানকী কর্তৃক মহাপ্রভুর ফুলসজ্জা।

সামগ্রিক মানুষের জীবনের কল্যাণ কথার প্রকাশ।

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের কালীনগরে বসতি :

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস হরিচাঁদ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত সাধক। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের বসতি ছিল মল্লকাঁদি গ্রাম। সেখানকার কৃষি জমিগুলিতে জল জমে অফলা জমিতে পরিণত হয়ে যায় এর ফলে সেখানকার মানুষেরা কৃষিকার্য্য ত্যাগ করে ব্যবসা করে সংসার জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু সাধু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস হরিভক্ত ফলে সে কৃষিকার্য্য করেন আর হরিবলে বেড়ান। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তকে বলেন শুধু ভক্তিতে জীবন ধারণ হয় না পরিবারকে রক্ষাও তার স্বকর্তব্য। হরিচাঁদ ঠাকুর বলেন মধুমতি নদীর ওপার গিয়ে কৃষিকাজ করে পুনরায় গৃহধর্মকে রক্ষার জন্য এবং সেই সঙ্গে সংকীর্ত্তন করো হরিনাম তাহলেই ধর্মকর্ম সুসম্পন্ন করতে পারবে। কবিরসরাজের বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

‘‘হরিচাঁদ বলে শুন ওরে মৃত্যুঞ্জয়।
এদেশে অজন্মা হল কি হবে উপায়।।
সকলে বাণিজ্য করি হইল ব্যাপারী।

তুমি ত বেড়াও শুধু বলে হরি হরি।।

.....

.....

গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম রক্ষা সুবিহিত।

কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহকার্য্য করাই উচিত।।

.....

তুমি যাও মধুমতি নদীর ওপার।

দিনকত থাক গিয়া বাছারে আমার।।

থাক গে চণ্ডীচরণ মল্লিকের বাড়ী।

জমি রাখ ধান্য পাবে কৃষিকার্য্য করি।।

মম অন্তরঙ্গ ভক্ত হবে সে দেশেতে।

তোমারে করিবে ভক্তি একাগ্র মনেতে।।

হরিনাম সংকীর্ত্তন কর দিবা রাত্রি।

তাহা হলে সবে তোমা করিবেক ভক্তি।।''[৪৬]

প্রথমে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস একা গিয়ে থাকলেন চণ্ডীচরণের বাড়ি পরে মাতা ও স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন সেখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায়।

''মহাপ্রভু আজ্ঞা দিল তাহাদের প্রতি।

সকলে কালীনগরে করগে বসতি।।

অদ্য নিশি গতে কল্য প্রভাত সময়।

শুভক্ষণে কর যাত্রা বুধের উদয়।।।

প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি অমনি চলিল।

আসিয়া কালীনগর বসতি করিল।।''[৪৭]

এভাবে ভক্তি যোগের সঙ্গে কর্মযোগের সম্মিলনে মানুষের দুঃখ দূর করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

মহাপ্রভু হরিচাঁদ ঠাকুরের জোনাসুর কুঠি যাত্রা :

হরিচাঁদ ঠাকুর জোনাসুর নীলকুঠিতে সাহেব দর্শনে যান। সেখানে যাওয়ার জন্য

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত দশরথ বিশ্বাসের গৃহে স্নান ভোজন করার আগে দশরথ বিশ্বাস সকল হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণকে দেখে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে পারিবারিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন তাতে তার আর্থিক দিক ধরা পড়েছে এবং এই মহৎ কাজ কখনোই বাধাপ্রাপ্ত হয় না অর্থনৈতিক কারণে সেই পরিচয় পাই। কবির বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"ভয় ভীত হল দশরথ।
ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখিয়া হল আতঙ্ক,
লোক হল দুই তিনশত।
দশরথ পদ ধরে, বলে প্রভুর গোচরে,
এত ভক্ত কৈল আগমন।
দৈবে লোক বহুজন করাতে স্নান ভোজন,
মম সাধ্য না হবে কখন।।"[৪৮]

হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বিশ্বাসকে বলেন যে, যে হরির চিন্তা করে, হরি তার চিন্তা করে। কার্য ক্ষেত্রে সেই ঘটনাই ঘটেছে। গ্রামের যত নারী সকলে মিলিত হয়ে যার যার বাড়ি থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী চাল, ডাল, তরকারী নিয়ে এসেছে সকল ভক্তগণের সেবার জন্য। এখানে হরিভক্তির পাত্রী যে গৃহবধূগণও তার সুন্দর বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়। কবির বর্ণনায়—

"কোন কোন নারীগণে, আশ্চার্য্য মেনেছে মনে,
শুনেছে ঠাকুর যাবে কুঠি।।
শুনেছে বাটী হইতে, দশরথের বাটিতে।
আসিয়াছে মতুয়া সকল।
কেহ এনেছে চাউল কেহ এনেছে ডাউল
কেহ আনে দধি দুগ্ধ ঘোল।।
কুষ্মাণ্ড কদলী আদি, তরকারী নানা বিধি,
থোড় মোচা শাক শিম মূল।
আলু কচুক আলুবু কেহ কেহ আনে লেবু,
কেহ আনে পদ্মবীজ মূল।।
ব্যঞ্জন লাবড়া পাক, সরিষা বাটা শুক্ত শাক,

মেয়েরা রন্ধন করে ঘরে।।''[৪৯]

এভাবে দশরথ বিশ্বাসকে নারীভক্তগণ সাহায্য করেছেন। এতে যেমন সামাজিক বাস্তব জীবন ফুটে উঠেছে তেমনি সকলের মানব মৈত্রীর কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীধাম ওড়াকান্দির ঘাটলা বন্ধন :

শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে গোলক গোস্বামী থাকতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরকে মনপ্রাণ সপে ভক্তি করতেন গোলক গোস্বামী। হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল গৃহকাজ করতেন গোলক গোস্বামী গুরুকার্য্য হিসাবে। গোলক গোস্বামী বৃদ্ধাবস্তায় একদিন ঠাকুরবাড়ির পুকুরের ঘাটটি ভেঙে গিয়েছিল তাই পুনঃরায় বাধার জন্য ঠাকুর গোলক গোস্বামীকে ডাকলেন ভক্ত গোলক সুন্দর পরিপাটি করে ঘাট বেঁধে দিয়েছিলেন। এরপর হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন পুকুরের শেওলাগুলো পরিস্কার করে দিতে। কিন্তু ভক্ত গোলক যে বৃদ্ধ হয়েছেন তার জন্য শীতের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছেন না। তাই গোলক গোস্বামী মনে মনে ভাবছিলেন কাজে এত কষ্ট এর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ। একথা শান্তিদেবী বুঝতে পেরে হরিচাঁদ ঠাকুরকে বলছেন গোলককে কষ্টের কাজ দিও না। তখন হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা অসাধারণ সহিষ্ণুতার শিক্ষা যা মানুষের একান্তই প্রয়োজনীয়। ঘাট বাঁধার বর্ণনাটি এরকম—

''ঠাকুর ডাকেন ওরে গোলক কোথায়।
ঘাট ভেঙে গেছে বাছা বেঁধে দে ত্বরায়।।
আজ্ঞামাত্র গোলক নামিল গিয়া জলে।
হেলে ছিল খাম্বাগুলি উঠাইল ঠেলে।।
ভাল করি খাম্বা পাতি বাঁশ পাতি দিল।
দৃঢ় করি আরো দুটি খাম্বা লাগাইল।।
দুই ধারে দুই বাঁশ দিলেন আড়নী।
তাহার উপরে বাঁশ পাতি দিল আনি।।
দুই ধারে বাধে ঘাট বিচিত্র বাখানি।
ঠিক যেন দুই থরে ইটের নিছনি।।''[৫০]

ঘাট বাধা হলেই স্নানের জন্য সকলে পুকুরে নামবে। সেখানে জলের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। তাই জল পরিস্কার করার কথাও গোলক গোস্বামীকে বলেন। গোলোক গোস্বামীর কষ্টের বার্তা পান শান্তিদেবী তাই ঠাকুরকে বারণ করেছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন—

''হারিলি কামের ঠাই বলেও হারিলি।
হারিলি শীতের ঠাই কূলে দিলি কালি।।''[৫১]

গোলক গোস্বামী তখন পূর্ব্বের মত শক্তিশালী হয়ে কাজ করেছিলেন এবং ঠাকুরও শান্তিদেবী শেষে গোলক গোস্বামীকে যা বলেছিলেন তা হল—

''মহাপ্রভু বলে হল পুকুর নির্ম্মল।
গোলোকের গুণে জল যেন গঙ্গাজল।।
গোলকে ডাকিয়া বলে দেবী শান্তি মাতা।
মরিতে চাহিলি এ বে শীত গেল কোথা।।
গোলক চরণে পড়ি কহিছে ভারতী।
জনমে জনমে যেন পদে থাকে মতি।।''[৫২]

গোলক গোস্বামীর কাহিনি থেকে বোঝা যায় জগতে যে ধর্মাচরণ করতে চায় তার জীবন ততখানিই কর্মময় হয়।

অথ শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর বিবরণ :

গৃহকর্ম নিপুনা নারীর স্বভাব সর্বদা স্বকার্য সাধন ও গৃহকে আদর্শভাবে রক্ষার দায়িত্ব নারীর। লোচন গোস্বামীর সেবা করতে অর্থাৎ অন্নভোজন করাতে স্বামীর ইচ্ছা থাকলেও তার ইচ্ছা নেই লোচন গোস্বামীর জন্য ভোজনের জোগাড় করতে। কেননা লোচন গোস্বামী ছিলেন শারীরিক ভাবে অসুস্থ। সেই জন্য নারী হৃদয়ে ছিল কিছুটা অবজ্ঞা। এছাড়াও তিনি ছিলেন গৃহকর্মেরত। পরে লোচন গোস্বামীর অনুরোধে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করেন। লোচন গোস্বামী ভোজনে বসলে সেই নারী দেখতে পেয়েছিলেন লোচন গোস্বামীর অসাধারণ রূপ। এ থেকে এ বোঝা যায় সমাজের মানুষ নারী কি পুরুষ সকলেই ভালো কাজ করতে চান ভাল দেখতে চান।

রামভরত মিশ্রের পুনরাগমন :

রামভরত মিশ্রের ভাবনায় ধরা পড়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শের পরিচয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে মানুষই বড় কোন জাতি বড় নয়। তাই তার কাছে সকল মানুষই গিয়েছেন প্রাণের টানে। সেখানে মানুষের জীবনার্ত্তিই বড় হয়ে উঠেছে। কবিরসরাজের বর্ণনায়—

> ''প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
> হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন অবনীতে।।
> ব্রাহ্মণ কায়স্থ সাহা শূদ্র সাধু নয়।
> ছত্রিশ বর্ণের লোক হল একত্তর।।''[৫৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম কর্ম করা মানুষের জন্য। তাই সেখানে মানুষই প্রধান। মানুষের উন্নতিই শেষ কথা। তাই এই মতুয়া ধর্ম সাহিত্যের সর্বত্রই মানুষের জীবন কথার প্রকাশ ঘটেছে।

রুদ্র উদ্ধার :

রুদ্র মণ্ডল হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণের নিন্দা করতেন। এমনকি 'হরিবল' বলে মতুয়া ভক্তগণ তার ঘাটের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চুপ করে চলে যেতেন। সেই রুদ্র মণ্ডলের ঘাটে গিয়ে গোলক গোস্বামী সকলকে বলেন আজ যার যত টুকু শক্তি আছে সব শক্তি দিয়ে ভক্তিসহ 'হরিবল' বলবে। গোলক পাগলের অভিপ্রায় হল রুদ্র মণ্ডলকে হরি ভক্ত করা। গোলক পাগলের কথায় ভক্ত সকলে হরিবল বলতে বলতে চলছিলেন এমন সময় রুদ্র মণ্ডল আসেন। লাঠি নিয়ে হরিভক্তগণকে মারার উদ্দেশ্যে। গোলক পাগল গিয়ে রুদ্র মণ্ডলকে দাদা সম্বোধন করে লাঠি নিয়ে সকলকে মারার উদ্দেশ্য যান আর 'হরিবল' বলেন এবং সকলে জোরে জোরে হরিবল বলতে বলতে রুদ্র মণ্ডল হরিভক্তগণের মাঝে পড়েন ও কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করেন। এবং পরে চেতনা লাভ করেন পরে বলেন হরিভক্তগণ সকলে পতিত পাবন। কারণ মানুষের হৃদয়ে প্রেম ভক্তির সঞ্চার করে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে চেতনা দান করেন। গোলক পাগলও সকলকে ভক্তি সহকারে ভোজন করিয়ে তিনিও হরি ভক্ত হন।

দেবী জানকী কর্তৃক মহা প্রভুর ফুলসজ্জা :

দেবী জানকী মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের ছোট বোন যিনি ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের এক নিষ্ঠ ভক্ত সাধিকা। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে গৃহে থেকেই ফুলের মালায় সাজিয়েছিলেন সাধনার দ্বারা হরিচাঁদ ঠাকুর সেই ফুল মালায় মনোহর বেশে সেজে ছিলেন সেই ফুল সাজে দেখেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের স্ত্রী কাশিশ্বরী এবং মাতা বোন জানকী সকলেই মহাযোগী, মহাভক্তি মতি। যার ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের ফুল সাজ সকলেই যোগ সাধন বলে দেখতে পেয়েছিলেন। জানকীর মাতৃসম ভ্রাতৃবধূ জানকীকে বলেন যে তার কোন চিন্তার কারণ নেই। হরিচাঁদ ঠাকুরকে নিয়ে তাঁর অগ্রজ এখনই এল, ফলে আর অনুমান ভক্তি সেবা বাদ দিয়ে বর্তমান সেবা করতে বলেন। কবির বর্ণনায়—

> ‘‘সত্বরে আসিল যথা যোগে ননদিনী।।
> কহে ডাকি সে জানকী ননদির ঠাঁই।
> ঠাকুর এসেছে তোর আর চিন্তা নাই।।
> কতক্ষণ এই রূপে আরোপে থাকিবা।
> অনুমান ছাড়ি কর বর্তমান সেবা।।’’[৫৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের গৃহ ভক্তিভাবের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। আর সঙ্গে একথা বলা যথার্থ হবে যে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ সকলেই ছিলেন ভক্তিভাবের এক এক জন মূর্ত বিগ্রহ। ফলে মতুয়া ধর্ম সাহিত্যেগুলিতে মানুষের বাস্তব সমাজ চিত্র পাই তাতে দুঃখময় জীবনে রয়েছে ভক্তির পূর্ণ বিকাশ। তাই এই মানুষগুলির আধ্যাত্মিক জগৎ যেমন পূর্ণ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর তেমনি গৃহ জীবনের উন্নতির পথকেও সুগম করেছেন তাদের কর্মাদর্শকে সঠিক ভাবে শিক্ষা দানের মাধ্যমে। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুর সর্বদাই সকলের মঙ্গলাঙ্খায় কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত হতেন। তারা মানুষের শুধুমাত্র আত্মচৈতন্য দানে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করেন নি, পূরণ করেছেন জীবনের পেটের ক্ষুধা ও জাগতিক মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষত্বের ক্ষুধাকেও। তাই তাদের ধর্মাদর্শ কখনোই বাস্তব সমাজ জীবনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন নি। করেছেন বাস্তব সমাজ জীবনের দুঃখ দুদর্শার থেকে উত্তরণের রাজপথ নির্মাণ এখানেই মতুয়া ধর্মের স্বাতন্ত্র্য।

সামগ্রিক মানুষের জীবনের কল্যাণ কথার প্রকাশ :

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রত্যেক মানুষের ধর্ম-কর্ম সমন্বয়ে জীবন গঠনের জন্য সর্বদা কাজ করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছেন ব্যথা বেদনায় জর্জরিত মানুষের কুলে। তাদের ব্যথার যেন শেষ ছিল না। কারণ এই নমঃ মানুষগুলির ভক্তির অভাব ছিল না ভগবানে। ছিল তাদের ব্যথাহারীর অভাব। সেই ব্যথাহারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুর যতদিন শরীর ধারী ছিলেন ততদিন এই মানুষগুলির কল্যাণ ব্রত সাধন করেছেন, এবং এই কল্যাণ কর্ম যাতে প্রবাহিত হয়ে চলে তাঁর জন্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে তিনি এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেন নিজেই। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' গ্রন্থে আচার্য মহানন্দ হালদার তাই যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মময় জীবন যাপনের অবস্থানকে। কবির বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

''ব্যথিতের ঘরে এল শ্রীহরি ঠাকুর।
কৃপা করি ব্যথিতের ব্যথা কৈল দূর।।
ব্যথিতের হেন বন্ধু আর কেহ নাই।
প্রাণের ঠাকুর তাই হরিচাঁদ সাঁই।।''[৫৫]

তিনি মানুষের ধর্মদান করেই শান্ত হন নি তিনি মানুষের রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট থেকে সার্বিক ভাবেই মানুষকে মুক্ত করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে ভাবে মানুষকে হরিচাঁদ ঠাকুর এই বাস্তব জীবনে সুখের শান্তির জগতে বসবাস করার সন্ধ্যান দিলেন তা মানুষের ভাষায় কবি বর্ণনা করেছেন—

''রোগ-শোক-দুঃখ-ব্যথা জ্বালা অপহারী।
পরম দয়াল রূপে এসেছে শ্রীহরি।।''[৫৬]

সকল দুঃখ যিনি হরণ করে মানুষকে আত্মচেতনার, আত্মজ্ঞান দান করে এই সংসার জীবন যাপনে অন্তহীন সুখের জীবনে উন্নীত করেন তিনিই যে 'হরি' সেকথা কবি রসরাজ তারকচন্দ্র বলেছেন—

''সকল হরণ করে তাঁরে বলি হরি।
.....
হরিচাঁদ আসল হরি পূর্ণানন্দ হরি।।''[৫৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিস্তারের সময় ভক্তগণ মিলিত ভাবে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে যেভাবে তাদের কথা বর্ণনা করেছেন সেই ভাবের মধ্যেই রয়েছে তাদের মনের ভাবনা। সকলের বিনীত নিবেদন ছিল ঠাকুরের কাছে এই—

''প্রভুর চরণে করি এই নিবেদন।
'মো' সবার থাকে যেন সদা এই মন।।
.....
হরিচাঁদে ঘরে পেয়ে ধন্য হইয়াছি।।
তাঁর ঘরে মহারত্ন গুরুচাঁদ তুমি।
পরম পবিত্র প্রভু তুমি অন্তর্যামী।।
.....
যেই শুভ দিনে এই জাতির ভিতর।
পরম দয়াল হরি হল অবতার।।
সেই দিনে পুনর্জন্ম পেয়েছে এ জাতি।
দিনে দিনে হবে এর অবশ্য উন্নতি।।''[৫৮]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই ছিলেন সংসারী মানুষ। তাই সংসারী মানুষের ব্যথাহারী হয়েই মানুষের জীবন গঠন করবেন এটাই কাম্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম ভাবনা তাই গৃহ জীবনের মধ্যেই পালন করে মহামানব হওয়ার ধর্ম। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম ও 'নামধর্ম' কথাই ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

''সংসারের মাঝে তাই গৃহস্থ সাজিয়া।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ নাম ধর্ম্ম নিয়া।।''[৫৯]

হরিচাঁদ ঠাকুরের 'নামধর্ম' হল 'হরিবল' নাম করা। মতুয়া ভক্তগণ সকলেই এই 'নাম ধর্ম' পালন করেন। মনিমোহণ বৈরাগী মতুয়া মানুষের এই 'নাম' ভাবনার আলোচান করেছেন। মতুয়াধর্মে ধর্ম ও কর্ম সমন্বয় সাধন করে ভক্তগণকে 'ধর্মকর্ম' এক সঙ্গে রক্ষা করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। মনিমোহণ বৈরাগী মতুয়াদের ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা হল—

''মতুয়া ধর্মে—ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে ধর্ম

শেষ হয় 'নাম' (বিজ্ঞান) নামক সমাধিতে (Meditation); তার পর আসে প্রেমরূপী বৃহত্তর কর্মবাদ। তাই সমাধি পুষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমষ্টিগত ভাবে অর্থাৎ গোষ্ঠী হিসাবে মনযোগ দেবেন জনকল্যাণ এটিই এর কাম্য। আর এখানেই হল এর বৌদ্ধিকতা। মতুয়া মন্ত্রে আছে এর ইঙ্গিত। যা নাম (বিজ্ঞান) এবং প্রেম ধর্মের বাইরের যাবতীয় কাজকে বাজে কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। তাইতো এই ধর্ম এবং কর্মযোগ সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ হল—

''জীবে দয়া, নামে রুচি, মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্ঠা।।''

অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়া, নামের (বিজ্ঞানের) প্রতি রুচি এবং মানুষের প্রতি নিষ্ঠা এটাই হল মতুয়া 'হরিবোল' মন্ত্রের তাৎপর্য।

অতঃপর মতুয়াদের নাম (বিজ্ঞান) নামক সমাধি থেকে ফিরতে হয় গৃহ ধর্মেও গৃহকর্মে। তবে এটা হল ধর্মের উচুস্তর, অর্থাৎ কর্মবাদ যার কাজ হবে জীবে দয়াও বহুজন হিতায় প্রেমের বন্ধনে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করা। তাই মতুয়াধর্মে গার্হস্থ্য আশ্রমের ভিতর দিয়েই বিচার হয়, কে সাধু আর কেই বা অসাধু।

''গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।''[৬০]

সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা রূপি মানুষের মানবিক গুণাবলীর যদি বিকাশ ঘটানো যায়, তবেই সংকীর্ণ মানসিকতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি ধর্মের আশ্রয়ে মানুষ নিজে যেমন সুন্দর, পৃথিবীকেও আরো সুন্দরও মনোরম করে গড়ে তুলতে পারেন। তেমনি আবার অন্যকেও সুন্দর হতে সাহায্য করতে পারেন। এটাই যদি সকল মানুষের মনোবৃত্তি হয় তাহলে সকলেই সমবেত ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন।

মানুষের দুঃখের কারণ ও দুঃখ থেকে আনন্দে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা :

আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শন লাভ করতে পারলে মানুষের জীবন পূর্ণতা পায়। অসীম

অনন্ত ব্রহ্ম মানব দেহেই অবস্থান করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অসীম অনন্ত আত্মা রয়েছে। জ্ঞান ভক্তির দ্বারা অসীমের সন্ধান পেতে মুনিগণ ধ্যান করতেন। ধ্যান যোগের মাধ্যমে আপন আত্মার সঙ্গে অনন্তের যোগাযোগ স্থাপন হয়। আত্মদর্শন করে আত্মানুভূতি লাভ করলে মানুষের পূর্ণতার সঙ্গে জীবন হয় শক্তি ভক্তি জ্ঞানের। সৌন্দর্যের মিলনে পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণ সনাতন মানবাদর্শের বিকাশ ঘটে। যে পূর্ণতা ঘটেছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনে। তিনি ছিলেন সেই অসীম আত্মদর্শনকারী মানুষ।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর আপন অনন্ত অসীম মানবাত্মার মাঝে নিজের স্বরূপ যেমন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তেমনি তিনি সকল মানুষের জন্য আত্মদর্শনের পথকেও উন্মুক্ত করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মদর্শন প্রসঙ্গে কবিরসরাজ বলেছেন—

''অনন্ত 'আপন' মাঝে প্রভু ডুবে রয়।
আপন স্বরূপ প্রভু দেখিবারে পায়।।
মহান পুরুষ রূপে আপনার আত্মা।
প্রভুর সন্মুখে আসি কহিলেক বার্তা।।
''নামধারী দেহ রূপে তুমি হরিচাঁদ।
জীব শিক্ষা লাগি নরজগতের নাথ।।
তুমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম উভয়ে অভিন্ন।
দেহ আত্মা মোরা দোঁহে মূলে নহি ভিন্ন।।''[৬১]

দেহের মধ্যেই সেই অসীম আত্মার বাসস্থান। তাই দেহ ও আত্মা মিলিতভাবে থাকে। আত্মদর্শন করলে সকল সংকীর্ণতার বিলোপ ঘটে এক অখণ্ড সত্ত্বায় উন্নিত হয় মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুর সেই অসীম অনন্ত সত্ত্বার বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষকে যে সহজ উপায় প্রদান করলেন। তা হল 'নামধর্ম'। তাই তিনি মানুষকে সর্বদা পবিত্র জীবনযাপন করার কথা বলেছেন। পবিত্র চরিত্রধারী হয়ে 'নামধর্ম' পালন করলে মানুষের সকল দুঃখের অবসান ঘটবে। তাই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য 'নামধর্ম' দিয়েছেন। তিনি মানুষের কল্যাণের পথ এভাবে উন্মুক্ত করলেন 'নামধর্ম' দ্বারা—

''তুলিয়া নামের ঢেউ প্রেম প্লাবনেতে।
ধূয়ে মুছে নিব সব নাম প্রবাহেতে।।''[৬২]

মনিমোহন বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম ভাবনার জ্ঞান সম্মতভাবে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনাটি হল—

> ''ঠাকুর হরিচাঁদই সর্বপ্রথম 'সংঘ সমাধির' (Mass Meditation) দিকে মনযোগ দেন এবং আবিষ্কার করেন 'হরিবোল' মহামন্ত্র যার মাধ্যমে 'সংঘ সমাধিতে' (Mass Meditation) পৌঁছান যায়। অর্থাৎ সমগ্র ব্যবস্থাটাই হল এখানে যৌগিক (Compund) প্রক্রিয়া। শুরুতেই এখানে ব্যষ্টি পৌঁছায় 'নাম' (বিজ্ঞান) নামক সংঘ সমাধিতে এবং সমাধিপুষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমষ্টিগতভাবে আবার ফিরে আসে গৃহ কর্মে।''[৬৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুর শশীভূষণ ঠাকুরকে মানুষের দুঃখের কারণও দুঃখ থেকে উত্তরণ ঘটে কীভাবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানুষের শরীর হয় পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা গঠিত। এই পঞ্চতত্ত্ব মধ্যেই থাকে ব্রহ্মশক্তি। পঞ্চতত্ত্ব ও আত্মার মিলন হলেই আত্মশক্তি সম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়। পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ মহাভূত হল আধার যা দেহ নামে পরিচিত। চিৎশক্তি হল আত্মা। দেহের মধ্যে এই আত্মা বা চিৎশক্তি থাকে বলেই মানুষের চলাফেরা সম্ভব হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষের গঠন ও মানুষের কর্ম সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা হল—

> ''এবে শুন কেবা কান্দে কিসের মায়ায়।
> ব্রহ্মের বিকারে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড যে হয়।।
> অবিকারী চিৎশক্তি ব্রহ্ম যা নাম।
> গুণাতীত সত্ত্বা সেই বি কুণ্ঠ নিষ্কাম।।
> ব্রহ্মের বিকার ভাগ হল পঞ্চ ক্রমে।
> ক্ষিতি অপঃ তেজঃ মরুদ্বোম্ পঞ্চ নামে।।
> অবিনাশী ব্রহ্মশক্তি নশ্বর বিকার।
> .....
> .....
> পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে যত সকলি নশ্বর।
> পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে ঘুরে ব্রহ্ম পরাৎপর।।

ব্রহ্ম ধরে 'আত্মা' নাম তত্ত্বে দেহ কয়।

উভয়ে মিলন হলে জীব সৃষ্টি হয়।।

ভূত'ত আধার মাত্র দেহ নাম ধরে।

চিৎশক্তি আত্মা আছে তাই চলে ফিরে।।''[৬৪]

মানুষের মধ্যে যে চিৎশক্তি রয়েছে আত্মা নামে তাকে জানতে হয় মানুষের সাধনার দ্বারা। মানুষ তার তত্ত্ব জানলে জীবনের দুঃখের শেষ হয়। মানুষ আত্মদর্শন না করলে জীবনে শুধু ভোগ তৃষ্ণায় রত হয়। এই ভোগ তৃষ্ণা থেকে উত্তরণ করে জীবন ধারণ করলে মানুষের জাগতিক দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে। ও সুখের আনন্দের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় মানুষ। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন—

''নিজ ভোগ জানি কর্ম্ম করিলে জীবাত্মা।

সেই কর্ম্মে ফলে ভোগ রুষ্ট পরমাত্মা।।

.....

.....

আত্মসুখ ভোগ ভুলি জীবে সাধে কর্ম্ম।

ফলহীন কর্ম্ম তাহা মহাজন ধর্ম্ম।।

পরমাত্মা প্রীতি হেতু যেই কর্ম্ম হয়।

ফলহীন কর্ম্মবলি জানিবে নিশ্চয়।।''[৬৫]

ফলহীন কর্ম করতে হলে লাগে ভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা। আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণই ভক্তি সহযোগে এই কর্ম সাধণ করতে সক্ষম হয়। এবং যে মানুষ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হয়েছেন তার সঙ্গে এই জীবাত্মা বা দেহ ও আত্মার মিলন হয়। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন—

''ফল শূন্য কর্ম্মে লাগে পূর্ণ নির্ভরতা।

তাঁর ইচ্ছা ক্রমে চলে, বলে তাঁর কথা।।

নিষ্কাম কর্ম্মেতে যবে জীবাত্মা চলয়।

পরমাত্মা সনে তার হয় পরিণয়।।

এই পরিণয় ফলে ফলে মোক্ষ ফল।।''[৬৬]

৬৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বের আগে সনাতনী ধর্মভাবনার উন্মেষ ঘটে। এই সনাতনী ভারতীয়দের যে

সনাতনধর্মী ধর্মভাবনা ছিল তা পঞ্চভৌতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষিতি অপঃ তেজঃ মরুৎ ব্যোম নামক পঞ্চমহাভূতের ধর্ম ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের নির্দশন। এই ভূতের দর্শন বা সনাতনী দর্শনের সাম্প্রতিক 'বর্তমান' পত্রিকায় আলোচনা বের হয়। ১৯৮৫ সালের ১৪ই অক্টোবর 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—

> ''সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতিগত বিজ্ঞানের উপর অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের এক আলোচনা চক্রে মন্তব্য করা হয় যে, আর্যদের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করার প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে সিন্ধু উপত্যকায় অতি উন্নত মানের এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্ষিতি অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূতের তত্ত্ব আর্য-সভ্যতা বহির্ভূত প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতার ধারকদেরই আবিষ্কার।''[৬৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর সেই সনাতনী ভূতের ধর্মকেই পুনরায় 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' নামে প্রচার করেন। যাকে মতুয়া ধর্ম নামে ভক্তগণ আখ্যায়িত করেন। তাই মতুয়া ধর্ম হল সনাতনী ভূতের ধর্মের প্রকাশ, সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' বা 'মতুয়া ধর্ম' নামে।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭।

২. চক্রবর্তী, সুবোধ, ভারতের সাধক সাধিকা, প্রথম প্রকাশ, কামিনী প্রকাশালয়, ১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, বৈশাখ, ১৪০০ সন, পৃ. ৭৯৪-৭৯৫।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯৮।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯৮।

৫. শ্রীনাভাজী রচিত, বৃহৎ শ্রীশ্রীভক্ত মাল গ্রন্থ, মে, বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরী, ১৬৭ ওল্ড

চিনাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০৯, পৃ. ৭৩০।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩০।

৭. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, ভূমিকাংশ থেকে গৃহিত।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫-২০৭।

১৫. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, নবম সংস্করণ, ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০৯, পৃ. ভূমিকাংশ থেকে গৃহিত।

১৬. হালদার আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪।

১৮. পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত ভূমিকাংশ।

১৯. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদ চরিত্র, সুধা প্রকাশক, আমতলী, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

২৩. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

২৭. সরকার, শ্রীঅশ্বিনীকুমার, শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত, দ্বাবিংশতিতম সংস্করণ, বারুণী মহামেলা, ঠাকুরনগর। ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, ২০১০, ভূমিকা থেকে নেওয়া।

২৮. পূর্বোক্ত, ভূমিকা থেকে নেওয়া।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৪।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ১২তম খণ্ড, মানুষের ধর্ম, জন্মশতবার্ষিক ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৫৬৮-৫৬৯।

৩৪. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ঠাকুরনগর, ১৪১১ সাল, ২০০৫, পৃ. ২৫-২৬।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৩৬. হালদার আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, নদীয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২৩৬।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭০।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০-২০১।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

৪৪. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৪।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

৫৫. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক বীণাপানি প্রেস, ঠাকুর নগর, ১৯৯৮, পৃ. ১১০।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৫৭. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

৫৮. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক বীণাপানি প্রেস, ঠাকুর নগর, ১৯৯৮, পৃ. ১০৯।

৫৯. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৮।

৬০. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাঁড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার, ২০১২, পৃ. ২৭।

৬১. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৬।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

৬৩. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাঁড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার, ২০১২, পৃ. ২৬-২৭।

৬৪. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক বীণাপানি প্রেস, ঠাকুর নগর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৬৭. বর্তমান পত্রিকা, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত।